দেবী দুর্গা ও তাঁর বাহন

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

দেবী দুর্গা প্রকৃতপক্ষে সমস্ত দেবাত্মশক্তির বিগ্রহরূপা। মানুষের মধ্যে দেবাত্মশক্তির জাগরণ ও বিকাশ না হলে মানুষের অন্তরস্থিত কামরূপী, লোভরূপী, ক্রোধরূপী, হিংসারূপী, বিবেকহীনতারূপী পশু ও অসুরের বিনাশ সম্ভব নয়। পশু ও অসুরের মিলিত রূপ মহিষাসুর তো আমাদেরই মধ্যস্থিত আমাদেরই কলঙ্কিত সত্তা। আবার দেবতেজঃসম্ভবা দুর্গা বা দেবশক্তিও মানুষের অন্তরস্থিত সত্তা। কিন্তু সেই সত্তা থাকে পশু ও অসুর-সত্তার দ্বারা আচ্ছন্ন। বিবেকের অঙ্কুশ যখন আমাদের চেতনাকে বিদ্ধ করে তখনি আমাদের প্রথম জাগরণ ঘটে। নিদ্রাভঙ্গের সেই প্রার্থিত প্রহরে আমাদের মধ্যে দেবসত্তার প্রথম উন্মেষ ঘটে। সেই উন্মেষকে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করতে হয় । সেই পথে অগ্রগতির জন্য প্রথমে চাই এই সচেতনতা-আমাদের শক্তি যেন বহুধা বিভক্ত না হয়, আমাদের শক্তিকে 'সংহত' বা 'কেন্দ্রীভূত' করতে হবে। কেন্দ্রীভূত শক্তির অর্থ বা তাৎপর্য 'সম্পদ' আহরণ। এই সম্পদ নিছক ঐহিক সম্পদ নয়, এই সম্পদ বুদ্ধিকে শুভব্রতে স্থির ও সদাজাগ্রত রাখার কৌশল। শুভব্রতে বুদ্ধিকে স্থির ও সদাজাগ্রত রাখলে নিত্য ও অনিত্যের 'জ্ঞান' বিকশিত হয়। কেন্দ্রীভূত শক্তি, বুদ্ধির স্থিরত্ব এবং জ্ঞানের বিকাশকে সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজন 'যোদ্ধৃত্ব' ও 'বীর্য'। এইসমস্ত যখন পূর্ণ বিকশিত হয়, তখনি আমাদের অন্তরে দেবশক্তি বা দেবীর বিকাশ সম্পূর্ণ হয়। সেই বিকাশই শিব বা সর্বকল্যাণের নিধান।

দেবী মহিষাসুরমর্দিনী। ঋগ্বেদে 'মহিষ' শব্দের অর্থ 'প্রভূত বলশালী'। (ঋগ্বেদ, ৮।১২।৮) মহিষাসুর প্রচণ্ড ক্ষমতাবান। শক্তির বিরাট জাগরণ হয়েছে তাঁর মধ্যে, কিন্তু সেই শক্তি মদমত্তশক্তি, অসংযত বিপুল শক্তি। মহিষাসুর যেন গণশক্তি বা শূদ্রশক্তির প্রতীক। পৃথিবীব্যাপী শূদ্রশক্তির প্রবলতা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই শক্তি যদি কল্যাণবুদ্ধি ও বিবেকঋদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত ও পরিচালিত না হয় তাহলে সেই অপরিমেয় শক্তি জগৎকে ধ্বংস করে দিতে পারে। শুধু ভোগতৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়পরতার দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কামনার তাড়নায় অন্ধ হয়ে শুভ-শুভ বোধ হারিয়ে তা মহাবিপর্যয় ঘটিয়ে বসতে পারে। শূদ্রের অপরিমেয় শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে শিবশক্তির দ্বারা। 'মর্দন' শব্দের অর্থ বিনাশ নয়, দমন। শূদ্রশক্তির নাশ নয়, শূদ্রশক্তিকে শিবশক্তির দ্বারা দমন করতে হবে, নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবেই বাঞ্ছিত ফললাভ হবে। এই দমনের কাজে শিবশক্তির সহযোগী শক্তি ঐক্যশক্তি, অর্থশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং বীর্যশক্তি। সুনিয়ন্ত্রিত শূদ্রশক্তি জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করতে সমর্থ। শূদ্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ঐক্যশক্তি, অর্থশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং বীর্যশক্তির দ্বারা, যার পিছনে থাকবে সামগ্রিক কল্যাণশক্তির প্রেরণা। সেই অবস্থাটিই রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতার সুষ্ঠু বিকাশ এবং উৎকর্ষের জন্য 'আদর্শ' অবস্থা।

আরেকটি দিক দিয়েও বিষয়টিকে দেখতে পারা যায়। যেকোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনবল, অর্থবল, জ্ঞানবল এবং বাহুবলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রাচীন ঐতিহ্যে এই বল চারটি বর্ণে বিভক্ত-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। চতুর্বর্ণের এই বিভাজন ভেদাত্মক নয়, কর্ম ও গুণাত্মক । আবার কোনটি কোনটির নিরপেক্ষ নয়। একে অন্যের সহযোগী এবং পরিপূরক। বস্তুত, একটি 'আদর্শ' রাষ্ট্রব্যবস্থা হলো সেটি-যেখানে ব্রাহ্মণ্যশক্তির জ্ঞান, ক্ষাত্রশক্তির শৌর্য-বীর্য, বৈশ্যশক্তির সম্পদ ও সম্প্রসারণশীলতা এবং শূদ্রশক্তির শ্রম ও দৈহিক শক্তি সংহত বা ঐক্যবদ্ধ বা সমন্বিত। লক্ষণীয়, এখানে সরস্বতী, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী, মহিষাসুর এবং গণেশ প্রত্যেকে স্ব-স্ব তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত এবং সমস্ত কিছুর মূলে উপস্থিত অবশ্যই শিব ও দুর্গা। এইভাবে পরিবার-সমন্বিতা দুর্গার ভাবনায় যেন সুস্থ সমাজগঠন, সুস্থ জাতিগঠন এবং সুস্থ রাষ্ট্রগঠনের ইঙ্গিতই আমরা পাই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ 'দেবীসূক্তে' দেবী নিজের সম্পর্কে ঘোষণা করছেন : "অহং রাষ্ট্রী"– আমিই বিশ্বভুবনের সম্রাজ্ঞী। জগৎ–রূপ রাষ্ট্রের আমিই কর্ত্রী।

দেবীর বাহন সিংহ। প্রবল পরাক্রান্ত মহিষরূপী অসুরের মর্দনের জন্য দেবীর বাহন সিংহ হওয়াই তো স্বাভাবিক, যার এক মুষ্ট্যাঘাতেই বিশাল মহিষের মস্তক চূর্ণ হয়ে যায়। কামরূপী মহিষকে পর্যুদস্ত করার জন্য বীর্যরূপী পশুরাজ কেশরীকেই তো প্রয়োজন। কামরূপী মহিষাসুর তমোগুণের প্রতীক। পৌরুষ ও বীর্যের শক্তিতে দীপ্তিমান সিংহ রজোগুণের প্রতীক এবং জ্ঞানময়ী দুর্গার মধ্যে সত্ত্বগুণ কায়াবতী। তমোগুণকে দমন করার জন্য প্রয়োজন রজোগুণ, আবার রজোগুণকে সত্ত্বগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সেজন্যই মহিষাসুরের ওপরে সিংহ এবং সিংহ আবার দেবীর চরণাশ্রিত। যেখানে অবিমিশ্র তমোগুণ সেখানে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। তমোগুণ যখন রজোগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তখন বিপর্যয়ের গতি হয় রুদ্ধ। কিন্তু বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তখনো তিরোহিত নয়। বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নির্মূল হয় তখনি যখন রজোগুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সেখানেই সাধকের গতির যতি নয়। কারণ, সাধকের লক্ষ্য সংসারবন্ধনের মূলোচ্ছেদ। অপকর্ষ ও উৎকর্ষের বিচারে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বের উত্তরোত্তর ব্যবধান থাকলেও সাধকের লক্ষ্য তিন গুণের সীমাকে অতিক্রম করা। কারণ, গুণত্রয়ই সংসারবন্ধনের মূল। অতএব শুধু তমঃ এবং রজঃ গুণের ঊর্ধ্বে ওঠাই যথেষ্ট নয়, সত্ত্বগুণের সীমাকেও অতিক্রম করতে হবে। সংসারবন্ধনের নিবৃত্তি এবং সাধনার সমাপ্তি হয় তখনি যখন সত্ত্বগুণের লেশটুকুও অন্তর্হিত হয়। দেবী শুদ্ধসত্ত্বময়ী। তিনি তাঁর রজোগুণান্বিত বাহন সিংহের মাধ্যমে তমোগুণাচ্ছন্ন মর্তপীড়ক মহিষাসুরকে নির্জিত করেছেন। মর্তে দ্বন্দ্ব থেমেছে, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু শিব বা নিত্য–কল্যাণের প্রতিষ্ঠা? তার জন্য প্রয়োজন দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে উত্তরণ। সমস্যার স্থায়ী সমাধান শুধু সেখানেই। কারণ, যে–ভূমিতে দ্বন্দ্ব, সেই ভূমিতে স্থায়ী সমাধান অসম্ভব। দ্বন্দ্বাতীত সেই ভূমি হলো ব্রহ্মনির্বাণ বা ব্রহ্মচৈতন্য উপলব্ধির ভূমি। ত্রিগুণাতীত সেই ভূমিতে পরম শিবের অবস্থান। সেজন্যই গুণময়ী দেবীর মাথার ওপরে গুণাতীত দেবাদিদেব শিবের অধিষ্ঠান। মর্তের মালিন্য যাকে স্পর্শ করতে পারে না, সেই উত্তুঙ্গ শিখরে পরম ধাম তুষারধবল কৈলাস অবস্থিত। শুদ্ধ মনের নির্মল মানস সরোবরে তার উদ্ভাসন ধরা পড়ে, কিন্তু তার পূর্ণ উপলব্ধির জন্য সাধককে সেখানে উপস্থিত হতে হয়। সেই উত্তরণেই সাধনার সমাপ্তি এবং সাধকের লক্ষ্যপ্রাপ্তি। সেই উত্তরণে যেন গঙ্গা এসে উপনীত হয় সাগরসঙ্গমে। এই মিলনের জন্যই তো গোমুখ থেকে ভাগীরথীর দীর্ঘ তীর্থযাত্রা। সাধকের ক্ষেত্রেও তীর্থগতির যতি নির্মল মানস সরোবরে অবগাহন করে সম্পূর্ণ মালিন্য–শুদ্ধ হয়ে সিদ্ধির কৈলাস–শিখরে উত্তরণে। সেই উত্তরণের অপর নাম জীবের শিবত্বলাভ–দেহীর ব্রহ্মময়ত্ব–প্রাপ্তি।

বস্তুত, যিনিই মহিষাসুর, তিনিই সিংহ, তিনিই দুর্গা এবং তিনিই আবার শিব। শুধু স্তরভেদ, শুধু আত্ম–উন্মোচন ও আত্ম–উপলব্ধির ক্রমিক অবস্থা। মহিষ–স্তর জীবের সর্বনিম্ন স্তর বা শক্তির অবিকশিত স্তর। সিংহ–স্তর জীব–শক্তির ক্রমবিকশিত বা ক্রমবিবর্তিত উচ্চতর অবস্থা। দুর্গা–স্তর ইন্দ্রিয়–নিয়ন্ত্রিত জগতে জীব–শক্তির সর্বোচ্চ স্তর। কিন্তু সেটিই সর্বশেষ স্তর নয়। তার পর জীব–শক্তির ইন্দ্রিয়াতীত পরম স্তর। সেটি শিব–স্তর, যেখানে জীব ও শিবের ব্যবধান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

বিষয়টি এইভাবেও ভাবতে পারি : মহিষাসুর–স্তর যেন যোগ বা তন্ত্রের প্রথম তিনটি পদ্ম বা চক্র–মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান এবং মণিপুর (লিঙ্গ, গুহ্য এবং নাভি)। সিংহ–স্তর যেন পরবর্তী দুটি পদ্ম বা চক্র–অনাহত এবং বিশুদ্ধ (হৃদয় এবং কণ্ঠ) এবং দুর্গা–স্তর যেন ষষ্ঠ পদ্ম বা চক্র–আজ্ঞা (ললাট/ভ্রূমধ্য)। পরিশেষে শিব–স্তর যেন সপ্তম বা সর্বশেষভূমি সহস্রার (মস্তক/ব্রহ্মরন্ধ্র)। মহিষাসুরই উত্তরিত হতে হতে ক্রমে সিংহ ও দুর্গা হয়ে অবশেষে শিবত্বে উন্নীত হলেন। পুরাণের মতে

মহিষাসুরের জন্ম শিবাংশে। মহিষাসুর আসলে জীবরূপী অবিকশিত শিব। অন্যভাবে বলা যায়, মূলাধারে অধিষ্ঠান কুণ্ডলিনী শক্তির। শক্তি তখন অব্যক্ত। সাধনার দ্বারা তার জাগরণ ঘটে। সেই জাগরণ ক্রমশ গুণগত উৎকর্ষে উত্তরিত হয় বিশুদ্ধে এবং পরিশেষে পরম অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয় সহস্রারে উত্তরণে। সেখানে অধিষ্ঠান শিবের। সেখানে শক্তি ও শিব মিলিত হন। অর্থাৎ জীব শিব হয়ে যায়। পুরাণে বলা হয়েছে, মহিষাসুরকে বধ করেই দুর্গা ''হরপাদমূলে'' প্রবেশ করলেন। (দ্রঃ বামনপুরাণ, ২০।৫১) শিব-দুর্গার এই একাত্মতার তাৎপর্য-মহিষাসুর কোন শরীরী জীব নয়, মহিষাসুর মানুষের অন্তর্নিহিত পশুত্বের প্রতীক। পশুত্বের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের দেবত্বের বিকাশ। মাতৃচরণে মহিষাসুরের নিত্য অবস্থানে সাধকের পরম শরণাগতির ইঙ্গিতও আমরা পাই। সন্তানভাব সর্বাপেক্ষা শুদ্ধভাব। জীব যখন সেই ভাবকে আশ্রয় করে তখন সর্বরিপুর আদিরিপু কাম আর মাথা তুলতে পারে না। আদিরিপুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তৃতীয় ও চতুর্থ রিপু লোভ এবং মোহ। পশুর মধ্যে মহিষ এই রিপুত্রয়ের প্রতীক। আর সিংহ? সেও মাতৃচরণে শরণাগত। সিংহ পশুরাজ, কিন্তু পশু তো নিশ্চয়ই। রিপুই তো মানুষের পশুত্ব। সিংহ দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ রিপুর প্রতীক-ক্রোধ, মদ এবং মাৎসর্য। মাতৃচরণে তাদেরও নিঃশেষে বলি দিতে হবে। মাতৃকরুণায় তখনি হবে জীবের জৈবসত্তার বিলয় এবং দৈবসত্তার জাগরণ। সেই জাগরণেই জীবের সার্থকতা, জীবনের চরিতার্থতা।

মার্কণ্ডেয় ও বামন পুরাণের মতে, দেবী যেমন সর্বদেবতেজঃসম্ভূত, দেবীপুরাণের মতে দেবীর বাহনও তেমনি সর্বদেবময়। দেবীপুরাণে বলা হয়েছে, দেবীর শত্রুদর্পনাশকারী বাহনকে স্বয়ং বিষ্ণু নির্মাণ করেছিলেন এবং তার মধ্যে সর্বদেবতার অধিষ্ঠান হয়েছিল। অর্থাৎ দেবীর মতো দেবীর বাহনও সর্বদেবময়। এর তাৎপর্য হলো, যে নিজের মধ্যে দেবাত্মশক্তিকে প্রকট করতে সমর্থ, দেবীর চরণাশ্রয় পাওয়ার অধিকারী সে-ই। সুতরাং জৈবশক্তিকে দমন করে তাকে দৈবশক্তিতে উত্তরণ করাবার ব্যঞ্জনাই নিহিত দেবীর সিংহবাহনত্বে।